সাপ্তাহিক সময়
১ম বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৪ মার্চ ১৯৯২

প্রতিকৃতি

# নির্মোহ জীবনের মোহমুগ্ধ শিল্পী

নির্মোহ জীবনের মোহমুগ্ধ শিল্পী
নির্মোহ জীবনের মোহমুগ্ধ শিল্পী
নির্মোহ জীবনের মোহমুগ্ধ শিল্পী

সাজ্জাদুর রহিম পান্থ

পেছন ফিরে আজ সাধন সরকারকে আলাদা করে চিনে নেয়া যায়। তখন দেখা যায়, কি অসাধারণ সাঙ্গীতিক প্রতিভা নিজেকে হাউইয়ের মতো জ্বালিয়ে ঊর্ধ্ব আকাশে উঠেছিল। এখন দেখতে পাচ্ছি, সাত বছরে সাধন সরকার যে অসংখ্য গানে সুর দিয়েছিলেন তাতে আগুন ছিল, মায়ের ভালোবাসা ছিল, প্রেম বেদনার করুণ মূর্চ্ছনা ছিল, জীবনের সংগ্রাম ছিল, কিংবা এ সবই হয়তো বাজারচলিত কথা--সাধন সরকারের গানে ছিল এই বাংলাদেশের মানুষের জীবনের জন্য রচিত সুরারোপিত ও গীত। সেখানে সাধন সরকার গান বলতে বোঝনে জীবন-জীবনের সব প্রয়োজনের সঙ্গী। তাই সাধন সরকারের গ্ল্যামার থাকবে না আশ্চর্য কি?'

বহুদিন পূর্বে হাসান আজিজুল হক ওপরের কথাগুলো লিখেছিলেন 'কবিতালাপ' আয়োজিত সাধন সরকার - সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের স্যুভেনীরে। কথাগুলোর ভেতর সাধন সরকারের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, তাঁর সৃষ্টির প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর এই অকৃতজ্ঞ সমাজ, সময় ও মানুষের প্রতি তীব্র শ্লেষ খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

সাধন সরকার আজ অসুস্থ-সৃষ্টির অন্তরালে। তার পৈতৃক লোনা ধরা পর্ণগৃহের মতোই সাধন সরকার আজ জীর্ণ, শীর্ণ, পীড়িত, শীতল। তাঁর সেই জোরালো কণ্ঠ, ভালোবাসার উষ্ণতা, যৌবনের তেজদীপ্ত শ্লেষ আর আত্মবিশ্বাসে ভরা কথা নেই! এখন তিনি শারীরিক অসামর্থ্যে চলাফেরাও করতে পারেন না! অন্ধকার, শীতল ঘরের এক কোণে ভীষণ একাকী, নির্জন, নিশ্চুপ সময় অতিবাহিত করেন। হয়তো যৌবনের সংগ্রামী কোনো স্মৃতি অথবা সৃষ্টির কোনো অনির্বচনীয় সুরের মূর্ছনার কথা ভেবে ভেবে নিঃসঙ্গ সাধন সরকার ঘুম অথবা ঘুমের ঘোরলাগা স্থির সময় অতিবাহিত করেন। যারা তাঁকে দেখেছেন তারাই জানেন কী অসম্ভব প্রাণশক্তি আর আত্মবিশ্বাসে ভরা ছিল এই মানুষটির হৃদয়। আজ শুধু কুয়াশাচ্ছন্ন চোখে অন্ধকার কক্ষে একা একা দৃষ্টিহীন চেয়ে থাকা।

অথচ সাধন সরকার কী অসাধারণ নিষ্ঠা আর মনোযোগ নিয়ে সঙ্গীত জীবনের শুরু থেকেই মানুষের মুক্তির জন্য, কুসংস্কার, শোষণ, পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর সৃষ্টি দিয়ে কর্ম দিয়ে, মেধা মননের সম্পূর্ণ সমর্পণ দিয়ে নিজেকে নিঃশেষিত করেছেন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি সংগ্রামে '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, এমনকি তার পরবর্তী সমস্ত আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর এবং তিনি অঙ্গাঙ্গিভাবে আমাদেরকে আরও চেতনাদীপ্ত করেছেন। আমাদের ভীরুতা, দোদুল্যমানতাকে ছিন্ন করে তাঁর গান আমাদের আত্মবিশ্বাসের শক্ত জমিনের উপর দাঁড় করিয়েছে। আমরা কি '৭১-এ 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' থেকে প্রচারিত সেই গান ভুলতে পারবো? -'বেরিকেড, বেয়নেট বেড়াজাল/পাকে পাকে তড়পায় সমকাল মারিভয় সংশয় ত্রাসে/অতিকায় অজগর গ্রাসে।'

সাধন সরকারের প্রতিভা এবং ব্যক্তিজীবন আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। তাঁর সমস্ত জীবনের সাধনা সঙ্গীত যে সঙ্গীত মানুষের সামগ্রিক মুক্তির জন্য অশিক্ষা-কুসংস্কার, শোষণ, বেনিয়া বিনোদননির্ভর সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নীরবে, নিঃশব্দে সংগ্রাম করে গেছে সেই সঙ্গীত নিয়ে। যে সংগঠন মানুষের এই মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করতে চেয়েছে সাধন সরকার অনিবার্যভাবে সেখানে এসেছেন সেই 'সন্দীপন' থেকে শুরু করে 'লেখক শিবির' পর্যন্ত। তাঁর যে প্রতিভা ছিল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বহু সুযোগ সন্ধানী শিল্পীদের মতো নিজেকে বিকিয়ে দিলে অনেক মূল্য পেতেন কিংবা প্রত্যক্ষ ঝিকিকিনির বাজারে না গিয়েও চটক আর চমক দেয়া জীবনবোধহীন সঙ্গীত চর্চায় যদি নিজেকে ব্যাপৃত করতেন তা হলেও তাঁর জরাগ্রস্ত শরীর তাঁর লোনাধরা ইটের পাঁজর বের করা বাড়ির মতো নিঃশব্দ নীরবে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতো না।

তাঁর সাঙ্গীতিক প্রতিভা নিয়ে বহুমাত্রিক আলোচনা সম্ভব এবং প্রয়োজনীয়ও। কিন্তু সে স্থান এটা নয়। কিন্তু তবুও কিছু পরিচয় দেয়া আবশ্যক। এখানে একথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁর অধিকাংশ সমাজ সচেতন মৌলিক কাজগুলো সংগঠনকেন্দ্রিক।

প্রথমেই যে সংগঠনটি নিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু, সেটা 'সন্দীপন'। এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের লেখা থেকেই পরিচয় পাওয়া যাবে, 'বাস্তবিক ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝিতে আমাদের একটি অদ্ভুত পরিবার গড়ে ওঠে। তার নাম সন্দীপন। আমি জানি একটি সংগঠনকে পরিবার বলা অনুচিত--বিশেষ করে সন্দীপনের মতো একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন যার কাজের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বেশী দূরের ছিল না, যার কর্মধারা বিষয়ে সংগ্রাম শব্দটির ব্যবহার অসঙ্গত নয় এবং যার ভূমিকা দেশ ও কালের পটে ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছিল।' এই 'সন্দীপন' '৬০-এর দশকের উত্তাল বিদ্রোহী দিনগুলোতে নাজিম মাহমুদ, আবু বকর সিদ্দিকের রচনায় আর সাধন সরকারের একক সুরারোপে গানগুলো হয়ে উঠছে সময়ের সাঙ্গীতিক ইতিহাস, আকাঙ্ক্ষার গীতিময় স্বরূপ। এই সময় সৃষ্টি হলো 'বেরিকেড, বেয়নেট, বেড়াজাল,'' 'আমাদের চেতনায় 'সৈকতে,' 'কৃষ্ণচূড়া আর রক্ত পলাশের রঙিন জাল বুনে', বজ্রকঠিন শপথ আবার লই সবাই' এ গাঁয়ে তখন রাত্রি শেষ', এর মতো অনন্য, অনবদ্য সব মর্মস্পর্শী গান। সন্দীপন-এ সাধন সরকার শুধু সুরকারই ছিলেন না, অন্যতম গায়কও ছিলেন। তাঁরই পরিচালনা আর তত্ত্বাবধানে এসব গানগুলো পরিবেশিত হতো এবং পাকিস্তানী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তুলতো। আজ সময়ের এই দূরত্বে দাঁড়িয়ে বলা যায়, 'সন্দীপন' বাংলাদেশের গণসঙ্গীত-এর সাংগঠনিক সচেতন ধারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সবচাইতে উজ্জ্বল এবং পথ প্রদর্শকের ভূমিকা রেখেছিল।

তারপর ১৯৭১। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ। সাধন সরকার যতদিন পেরেছেন ততদিন দেশের মাটি কামড়ে পড়ে ছিলেন। স্বাধীনতার অল্প কিছু দিন আগে ভারতে গিয়েছিলেন। নানা কারণে তখন তিনি তেমন উল্লেখিত ভূমিকা রাখতে পারেন নি। স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে এলেন। এবার যাত্রা ভিন্নভাবে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে। এবার এলেন

আজীজ খান। খুলনার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের আরেক প্রাণ পুরুষ। গঠিত হলো 'স্কুল অব মিউজিক'। এ পর্যায়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধন সরকারও যেন একটু স্থির হলেন। শুরু হলো সঙ্গীত নিয়ে গবেষণা। বাংলা আদি সঙ্গীতের রূপ রুপদ সঙ্গীত শুধু সামন্ত সংস্কৃতির বাহন হিসেবে না রেখে তাকে বাংলা সঙ্গীত-এর বিকাশের নতুন আঙ্গিক এবং মাত্রায় ব্যবহার করা, বিদেশী লোকজ সুরকে বাংলা সঙ্গীতে ব্যবহার সর্বোপরি সব কিছু মিলিয়ে একটি সঙ্গীতের ইন্সটিটিউশন প্রতিষ্ঠা করার কাজে নামলেন সাধন সরকার। এ সময়ে তিনি নিজেও গান, গল্প, সঙ্গীতবিষয়ক প্রবন্ধ, এমনকি রাগও সৃষ্টি করলেন রাগ ভাটিয়াল'। বাংলাদেশে যে দু'একজন বিরল সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব নতুন রাগ সৃষ্টি 'রাগ সৃষ্টি করেছেন সাধন সরকার তাঁদের অন্যতম। 'রাগ ভাটিয়াল'-এর ক্ষেত্রেও তাঁর দেশজ লোকসঙ্গীত এর প্রতি মমত্ব এবং অনুরাগ সুস্পষ্ট। এসব সৃষ্টিশীল কাজ মানুষের মুক্তির লক্ষ্যকে অনুষঙ্গ করে সাধন সরকার প্রতিনিয়তই দারিদ্র্য আর বঞ্চনার সীমাহীন গহনে ক্রমেই নিমজ্জিত হন। সঙ্গীত এবং সংগ্রামের জন্য তাঁর এই ব্যক্তিগত ত্যাগ এটাকে তাই সাধন সরকার-এর প্রতিভা থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। উচিতও নয়। কারণ প্রতিভা অনেক সময়ই সুযোগ সুবিধার কানাগলি তৈরী করতে পারে; কিন্তু সাধন সরকার পেছনে ফেরার সব পথ এক একে রুদ্ধ করে শুধু সঙ্গীতের খেয়ায় ভেসে আর আদর্শের প্রজ্জ্বলিত মশাল নিয়ে একা নিঃসঙ্গ এগিয়ে চলেন--এ চলায় কিছুই তাকে যেন স্পর্শ করতে পারে না--না লোভ, না দুঃখ দারিদ্র্য, হতাশা, প্রতিষ্ঠার মোহ,-কিছুই না। মানুষের মুক্তি যাঁর আরাধ্য, সৃষ্টি পূর্ণতা যার লক্ষ্য তিনি কখনই নিজেকে মানুষ এবং সৃষ্টির উর্ধ্বে স্থাপিত করেন না। সাধন সরকার তাই এত বড় প্রতিভা নিয়ে কখনোই প্রচারমুখি অথবা অর্থলোভী সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাই দারিদ্র্য তাঁর আজীবনের সঙ্গী। অবজ্ঞা আর অবহেলা তাঁর নৈমিত্তিক পাওনা। ভীষণ নিঃশব্দে, ভীষণ নির্মোহ নির্লিপ্ততা নিয়ে শুধু আরাধ্য সাধনায় নিমগ্ন হন। কী ভয়ঙ্কর নির্বেদ! এ যেন মাটির গভীরে শিকড় প্রোথিত করে বৃক্ষের অবিচল বেড়ে ওঠার নিবিষ্ট সাধনা। সাধন সরকার-এর জীবনাচরণ তাই মধ্যবিত্ত সুযোগ সন্ধানী চরিত্রের বিরুদ্ধে অলক্ষ অথচ দৃঢ় প্রতিবাদ।

তবু সাধন সরকারকে যাঁরা প্রাণের গভীরে অনুভব করেন, তাঁর সৃষ্টিকে যাঁরা মানুষের জীবনবোধের গভীরে পৌঁছে দিতে চান কিংবা সাধন সরকার যাঁদের জন্য তাঁর ভালোবাসা উৎসর্গ করেন তাঁরা জানেন, জানেন সাধন সরকার নিজেও--

*'একেলা যেতাম যে প্রদীপ হাতে*
*নিভেছে তাহার শিখা*
*তবু জানি মনে তারার ভাষাতে*
*ঠিকানা রয়েছে লিখা।'*

দৈনিক তথ্য

১৬ এপ্রিল ১৯৯২

# সাধন সরকারকে জানানো হয়েছে নববর্ষের শুভেচ্ছা

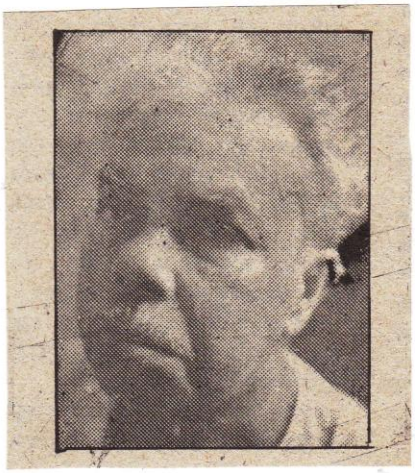

তথ্য প্রতিবেদকঃ পয়লা বৈশাখ। নববর্ষের প্রথম ভোরের সূর্য্য যখন পশ্চিম আকাশের দিকে সবেমাত্র হেলতে শুরু করেছে, তখন কয়েকজন সাংস্কৃতিক কর্মী অনেক ফুল আর কয়েকটি ফুলের তোড়া নিয়ে হাজির হয়েছিলেন খুলনার বরেণ্য শিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ সাধন সরকারকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে। জানিয়েছেন শুভেচ্ছা।

পয়লা বৈশাখের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছিল গানে গানে মুখরিত। অতীতে সাধন সরকার প্রতিটি পয়লা বৈশাখে উদ্যোক্তা এবং শিল্পীর দ্বৈত ভূমিকা পালন করতেন। বর্তমানে তিনি গুরুতর কিডনী রোগে আক্রান্ত। সূর্যোদয় থেকেই তিনি বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিলেন। স্মৃতিতে জ্বল জ্বল করে ধরা দিচ্ছিল অতীতের অনেক পয়লা বৈশাখের ঘটনা। অনেক অনুষ্ঠানের কথা। সেই আটচল্লিশ থেকে একানব্বই পর্যন্ত গানে গানে মুখরিত স্মরণীয় দিনগুলির কথা।

এমন ক্ষণে কয়েকজন সাংস্কৃতিক কর্মীর আগমন ও শুভেচ্ছা জানানোতে ক্ষণেকের জন্য শিল্পী সাধন সরকার বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। চোখের কোনায় জমে উঠেছিল কয়েক ফোটা অশ্রু। তারপর শান্ত হয়ে বললেনঃ 'পয়লা বৈশাখের ঐতিহ্যকে সমুন্নত রাখা প্রত্যেক সাংস্কৃতিক কর্মীর আদর্শিক দায়িত্ব। আমি মৃত্যু পথ যাত্রী। গানে গানে মুখরিত হোক সংস্কৃতি ভুবন। পয়লা বৈশাখ হোক আমাদের জাতীয় মহোৎসবের দিন।'

উল্লেখ্য, খুলনা নান্দীক একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বাদশার নেতৃত্বে কয়েকজন সাংস্কৃতিক কর্মী বরেণ্য শিল্পীকে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন অসুস্থ্য শিল্পীর বাড়ীতে। পয়লা বৈশাখের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে নান্দীক একাডেমী এক ব্যতিক্রম ধর্মী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে তাকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এই অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র। কিন্তু মহৎ। সব সঙ্গীত শিল্পীদের জন্য আজ অপ্রত্যাশিত।

জনবার্তা ২১ এপ্রিল ১৯৯২

শিল্পী সাধন সরকার

# সুরের আকাশে তুমি যেগো ধ্রুবতারা

খুলনার সঙ্গীতাঙ্গণের দিকপাল ওস্তাদ সাধন সরকার নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। তার দুটি কিডনীই অকেজো। ছোখে দেখতে পাননা। ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্ত চাপ প্রতিনয়ত মৃত্যু পদধ্বনি শোনায়। দৃষ্টিহীন দুচোখে তবু তাঁর বাঁচার স্বপ্ন। হৃদয়ের স্বর লিপিতে অস্ফুট উচ্চারণে বার বার গেয়ে ওঠেন 'মরিতে চাহিনা আমি।' কখনো ভাবেননি সুর সাধক তার জীবন থেকে হারিয়ে যাবে গীতিময়তা। কালের বেহাগী সানাইয়ে তার জীবন সঙ্গীত গাওয়া হবে ব্যথাথতুর সূরে।

বিধি বাম! কয়েক বছর হল তিনি হারিয়েছেন জীবনের সুর। হাজার কথার মালায় গেঁথে দিতে ইচ্ছে করে সুরের পিউকাহা ফুল। কিন্তু কে দেবে? অক্ষম সাধন সরকার আর উড়তে পারেননা সুরের আকাশে।

ক'দিন আগেই বর্ষ বরন অনুষ্ঠিত হল। হলুদ পাতার মত ঝরে পড়া একটি বছরকে পিছে ফেলে পয়লা বৈশাখে সবার জীবন শুরু হ'ল আবার নুতন করে। খুলনার সাংস্কৃতিক অঙ্গণে বেজে উঠলো চিরায়ত লোক ঐতিহ্যের সুর। সাধন সরকার সাড়া দিতে পারেনি বর্ষ বরণে। বিমর্ষপতুর মধ্যদিয়ে কাটে তার নতুন বছরের প্রথম দিন। শুভাকাংখী অনেকেই ফুল দিয়ে এসে ছিলেন সেদিন তাঁর কাছে। দৃষ্টিহীন দুচোখে অপলক চেয়ে গুচ্ছ রজনী গন্ধা হাতে তুলে নিলেন। অনুভব করছেন নববর্ষে বাঙালী হৃদয়ের ব্যঞ্জনা। এমনি বিমর্ষতার মধ্যদিয়ে তিনি পর পর কাটিয়েছেন কয়েকটি পয়লা বৈশাখ।

ক'দিন আগে সঙ্গীতাচার্যের সাথে সাক্ষাত করতে আমি এবং দৈনিক জনবার্তার আলোক চিত্রি আব্দুল গাফফার তার মির্জাপুরস্থ বাস ভবনে যাই। ঘরে ঢুকেই তাকে ম্লান মুখে বসে থাকতে দেখলাম। মুখ চোখ মুখ ফোলা-ফোলা। পরিত্যক্ত কিডনীর প্রভাব শরীরের অন্যান্য প্রত্যাঙ্গ ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পরিচয় দিতেই তিনি বসতে বললেন। আন্তরিকতার সাথে সবিনয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

আজীবন সুর সাধক সরকার অপসংস্কৃতির ঘোর বিরোধী। জীবনের এ সংকট মুহূর্তেও তিনি প্রগতিবাদী চিন্তা চেতনা আপর্ন হৃদয়ে লালন করেন। তিনি চান আমাদের সমাজ হোক সঙ্গীতের মত সুন্দর। আর এ সুন্দর সমাজ গড়ার জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক বিপ্লব। নরম কণ্ঠে অসুস্থ্য শিল্পী এ বলিষ্ঠ ভাষা উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন .সুস্থ্য সংস্কৃতি বিকাশের মধ্যদিয়ে সাংস্কৃতি বিপ্লব ঘটানে সম্ভব। তবে প্রগতিবাদী শিল্পীর বড় অভাব। অশিক্ষা এবং ধর্মানুতা এর প্রধান অন্তরায় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

কবে থেকে তিনি সঙ্গীতের সুরের সাথে নিজেকে বেধেছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'বাল্যকাল থেকেই আমি গান গাওয়া শুরু করি।' তখন সবে শ্বেতাঙ্গরা সাগর পেরিয়েছে। তার মা ছিলেন একজন গায়িকা। সনাতনী বিভিন্ন উৎসব পার্বনে তিনি ধর্মীয় সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। মায়ের অনুপ্রেরণা তার কাছ থেকেই সাধন সরকার সঙ্গীতের শিশু পাঠ্য গ্রহণ করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মায়ের সাথে কণ্ঠ মিলাতেন।এভাবে বালক সাধন সরকার সঙ্গীতের প্রতি ঝুকে পড়েন।

ষাটের দশকে এসে তিনি সঙ্গীতের অধিকাংশ সুর-তাল আয়ত্বে আনেন। এবং গানের কথায় সুরারোপ করেন। ওস্তাদ রইচ উদ্দীন মুন্সি ও কালিদাস চট্টপাধ্যায় তাঁর ওস্তাদ। পৃথক পৃথক ভাবে এ দুই সঙ্গীতাঙ্গের সাহায্যে থেকে তিনি সুরের অনুশীলন করেন।

তিনি বিভিন্ন ধর্মী গানের সুরারোপ করেছেন তবে ক্লাসিক্যাল গান তার ভালোলাগে। গণ মানুষের শোষন বঞ্চনা তার শিল্পী মনে বার বার দাগ কেটেছে। তাই তিনি অসংখ্য গন সঙ্গীতে সুরের হাতিয়ার তুলে দিয়ে তা করেছেন প্রাণরঞ্জ।

খুলনার সঙ্গীতা চর্চা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। খুলনার শিল্পীর সংখ্যা ও পরিসর যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু সঙ্গীতাঙ্গনের কোয়ালিটি বাড়েনি। এখানে সঙ্গীতের সৃষ্টি ধর্মী -শিল্পের বিকাশ ঘটছেনা। এছাড়া খুলনায় যে গুটি কয়েক ওস্তাদ রয়েছে তারা সবাই প্রবীন। তরুন শিল্পীদের মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ নেই বললেই চলে।স্থানীয় শিল্পীদের গতি-প্রকৃতির পরিবর্তন না! ঘটলে খুলনার সঙ্গীতাঙ্গণে বড় কিছু আশা করা যায়না। অধিকাংশ হালকা রস ও সুরের সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

এসব কথা গুলো তিনি খুব নরম স্বরে উপস্থাপন করছিলেন । কথা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাকে আর প্রশ্ন করে বিব্রত করা সমীচীন নয় ভেবে নীরবতা পালন করি।

তার পুত্র বিশ্বজিৎ সরকার দে কে ডেকে শিল্পীর শরীরের অবস্থা সম্পর্কে খুটি নাটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছিলাম। বিশ্বজিৎ বি, এ, পরীক্ষার্থী ওরা ৩ ভাই ১বোন। বড় ভাই ঢাকা ভার্সিটির ফার্মাসিষ্ট ডিপার্টমেন্টের লেকচারার । পি, এস. ডি করতে লন্ডনে গেছেন। অন্যান্যরাও অধ্যায়নরত। সবাই সঙ্গীতের সমরুদার ও শিল্পী ।

সাধন সরকারের পরিবার বর্গ তাকে নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন মনে হল। প্রতি সপ্তাহে তাকে ২/১বার করে ডায়লেসিস করা হয়। এতে মোটা-অংকের টাকা বির্পস্ত পরিবারকে বহন করতে হচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সংবেদনশীল ব্যক্তিবর্গ তাকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছেন। তার দোরারোগ্য অবস্থা থেকে মুক্ত করতে ঢাকা ও কলিকাতার পিজি হাসপাতাল ও পরে কলিকাতাস্থ বেলভিউ নাসিং হোমে চিকিৎসার জন্য নেয়া হয়। কিন্তু তিনি আরোগ্য লাভ করেননি। বরং ব্যধির জটিলতা আরো বেড়েছে। এই জটিল অবস্থার মধ্যদিয়ে কাটছে তার প্রতিটি দিন।

স্বাধীনতার পর থেকে সাধন সরকার খুলনা বেতারে সুরকার হিসাবে যোগ দেন। বেতার বহু গানে তার সুরের উচ্ছ্বাস জড়িয়ে আছে। তিনি পাকিস্তান আমলে খুলনায় অনুষ্ঠিত সুন্দর বনসঙ্গীত সম্মেলন নামে এক সঙ্গীত জলমায় সঙ্গীত পরিবেশন করে স্বীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এ সংগীত সম্মেলনে ভারতের কতিপয় খ্যাতিনামা শিল্পী ও সঙ্গীতের পরিবেশ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন সতীনাথ মুখপধ্যায় উৎপলাসেন, প্রসুন বন্দপাধ্যয়, অমরেশ লাহিড়ী। সাধন সরকারের গান শুনে সবাই মুগ্ধ হন। এছাড়া তিনি ঢাকায় ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীত সম্মেলনে অংশ নেন। এ সঙ্গীত সম্মেলনে তার দল তদানিন্ত পূর্ব পাকিস্তানের মধ্য থেকে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। কর্তৃপক্ষ তাকে সম্মান সুচক সনদ পত্রও পদক প্রদান করে।

খুলনা পৌরসভা শতবর্ষ পুর্তি অনুষ্ঠানেও তাকে গুনীজন হিসাবে পদক প্রদান করা হয়। ১৯৯০এ সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট খুলনার পক্ষ থেকে তাকে একুশে পদক প্রদান করা হয়।

গুনীশিল্পীর সব দুয়ার এখন বন্ধ। নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ব্যধি যন্ত্রনার সাথে তিনি সংগ্রাম করে বেঁচে আছেন। আমরা তাঁর রোগ মুক্তিও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

*-স,ম, গোলাম মোস্তফা*

দৈনিক তথ্য

৯মে ১৯৯২

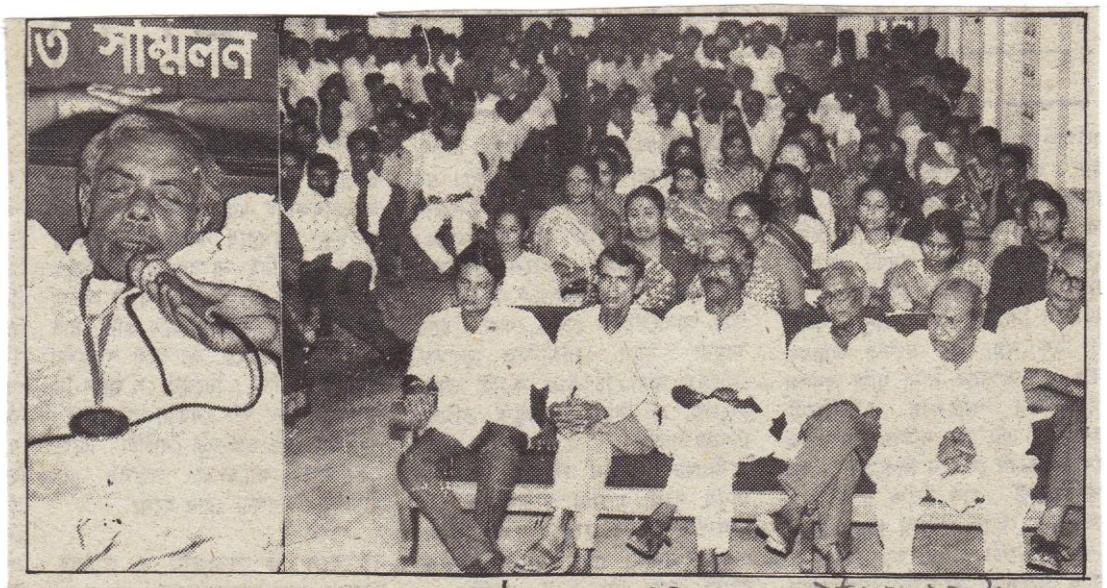


*শিল্পী সাধন সরকারকে দেয়া সংবর্ধনার জবাবে বক্তৃতা করছেন অসুস্থ শিল্পী।* ৯ই মে,১৯৯২ইং-তথ্য

"দৈনিক তথ্য"

### সংবর্ধনার জবাবে শিল্পী সাধন সরকার

# "আমি কথা কখনো বলিনি, সারাজীবন গান শুনিয়ে গেছি"

*তথ্য প্রতিবেদক ঃ* শিল্পী সাধন সরকার বলেছেন, "আমি কথা কখনো বলিনি, সারাজীবন গান শুনিয়ে গেছি। এ দেশটা মুসলমানের, হিন্দুর, খ্রীষ্টানের না বৌদ্ধের? -এ বিতর্কই বহুদিন ধরে চলে আসছে, কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক বোধের উর্ধে যে মানবতাবোধ, সেই মানবতাবোধের বাস্তব প্রমাণ আমি নিজেই। আমার আর কিছুই বলার নেই"।

গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ খুলনা শাখা আয়োজিত শিল্পী সাধন সরকার সংবর্ধনা ও জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদের জাতীয় সম্মেলনে শিল্পীকে প্রদত্ত পদক ও উত্তরীয় হস্তান্তর অনুষ্ঠানে সংবর্ধনার জবাবে শিল্পী একথা বলেন। প্রচন্ড শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রথমে তিনি বক্তৃতা করতে অপারগতা প্রকাশ করলেও উপস্থিত সুধীজনের অনুরোধে শেষাবধি তিনি একথাগুলো বলেন।

অনুভূতি প্রকাশ করেন অধ্যাপক সুশান্ত সরকার ও কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক। সংবর্ধনা সঙ্গীত পরিবেশন করেন সাধন ঘোষ, ভারতী ঘোষ, দীপা বন্দোপাধ্যায় ও আব্দুস সবুর খান চৌধুরী। সম্মিলন পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির দেয়া পদক ও উত্তরীয় অর্পন করেন এ্যাডভোকেট ময়ীনউদ্দীন আহমেদ। শিল্পী সহায়তা বিষয়ক তথ্য প্রদান ও বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিত আলোচনা করেন অধ্যাপক আজিজ হাসান। বক্তৃতা করেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে শিল্পী সাধন সরকারের সুরারোপিত গান গেয়ে শোনান মলিনা দাস ও ভারতী ঘোষ। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কালীপদ দাস।